শ্রেণী, রাষ্ট্র ও রাজনীতি-১

মজুরের দেশে শ্রেণীবিন্যাসের গতিমুখ

আনু মুহাম্মদ

এই প্রবন্ধে বিশ শতকের বিভিন্ন ভাগে এই অঞ্চলের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে একটি রূপরেখা হাজির করা হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ সময়কালে গ্রাম ও শহরের শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এই লেখায় রাষ্ট্র, অর্থনীতির গতিমুখ, শিল্প খাতের ধরনের সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর কাঠামোগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তী পর্বগুলোতে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্র, বাংলাদেশের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতায় শ্রেণী ও ক্ষমতা বিন্যাসে গোষ্ঠী, ধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থান, সমাজে মুক্তির চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্ব সহ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে এই লেখা সম্প্রসারিত হবে।

সমাজ অর্থনীতি গঠনের বিভিন্ন পর্বে একদিকে উৎপাদক ও অন্যদিকে মালিকশ্রেণী বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়। শ্রেণীর ভাঙন ও গঠনও একটি অবিরাম ক্রিয়া। বিন্যাসে পরিবর্তনও তাই অবশ্যম্ভাবী। গত ১০০ বছরে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বহু রকম পরিবর্তন হয়েছে, শ্রেণীবিন্যাসেও পরিবর্তন হয়েছে কয়েক দফা। বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন সমাজে যে শ্রেণীবিন্যাস ছিল, গত চার দশকে তার মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে বিস্তর।

সংখ্যার বিপুল গরিষ্ঠতা বিবেচনা করলে বলতে হবে, বাংলাদেশ শ্রমিক বা মজুরের দেশ। মজুর বলতে সেই মানুষকেই বোঝায়, যে তার শারীরিক মেহনত বা শ্রমশক্তি বিক্রি করে জীবন ধারণ করে। শ্রমিকশ্রেণী বলতে প্রথমে শিল্পশ্রমিকের ধারণাই মাথায় আসে। তবে বাংলাদেশে তো বটেই, বিশ্বের সব অঞ্চলেই পুঁজির ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার কাছে শ্রমশক্তি বিক্রির মানুষ অর্থাৎ মজুরেরও বিস্তার ঘটে সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বহুদূর। সেজন্য শুধু শিল্প খাতের মধ্যেই শ্রমিক পরিচয় সীমাবদ্ধ রাখলে পুঁজির আধিপত্য ও ক্রিয়ার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে না। পুঁজির কাছে শ্রমশক্তি এবং/অথবা মেধাশক্তি বিক্রি করে উদ্বৃত্ত মূল্য সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছে এ রকম নারী-পুরুষের সংখ্যাই সমাজে বিপুল গরিষ্ঠ। তবে সকলের এই পরিচয় স্পষ্ট থাকে না। তাছাড়া বাংলাদেশে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেই এখন বেশি। পরিবহন, নির্মাণ, দোকান ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছেন বিপুলসংখ্যক মানুষ, যার মধ্যে শিশু-বৃদ্ধ আছে, আছে নারী-পুরুষ। নতুন প্রযুক্তির খাত, যেমন–মোবাইল, আইটিসহ বাণিজ্যিক শিক্ষা, চিকিৎসা–সকল ক্ষেত্রেই বিভিন্ন স্তরের মজুরদের সংখ্যা বেশি, তবে তাদের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই ঢাকা দেওয়া। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পুঁজির বিপরীতে মানুষেরা অসংগঠিত, অস্থায়ী, অস্বচ্ছ কর্ম শর্তে নিয়োজিত।

যে কোনো সমাজে প্রধান শ্রেণীগুলোর পরিবর্তন যতটা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, নতুনের মধ্যে পুরনোর ধারাবাহিকতা ততটা হয় না। সাংস্কৃতিকভাবে নতুনের মধ্যে পুরনোর ধারাবাহিকতা কম শক্তিশালী নয়। বাংলাদেশের মতো দেশে পুরনো সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পুঁজির আপোসরফার মধ্য দিয়ে কিছু বিশেষ ধরনও টিকে থাকে। পুরনো দাস প্রথা ভূমিদাস প্রথার অস্তিত্বও খুঁজলে পাওয়া যায়। খুব স্পষ্টভাবেই মজুরিবিহীন শ্রমের অস্তিত্ব আছে, আছে অস্বীকৃত শ্রম। আইএলও কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করলেও তার থেকে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার অনেক দূরে। মার্কস ১৮৬৭ সালে জার্মানির অবস্থা প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা বাংলাদেশের মতো বহু দেশে এখনও প্রাসঙ্গিক মনে হবে, 'আমরা শুধুমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের কারণে যে দুর্ভোগের শিকার হই তা নয়, আমরা এর অসম্পূর্ণতার কারণেও ভুগি। আধুনিক শয়তানের পাশাপাশি সারিবদ্ধ সব পুরনো শয়তান দ্বারাও আমরা নিপীড়িত হই।....আমরা শুধু যে জীবন্ত দ্বারা ভোগান্তির শিকার হই তা-ই নয়, আমরা শিকার মৃতদের দ্বারাও।'[১]

> 'আমরা শুধুমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের কারণে যে দুর্ভোগের শিকার হই তা নয়, আমরা এর অসম্পূর্ণতার কারণেও ভুগি।'

এই প্রবন্ধে বিশশতকের বিভিন্ন ভাগে এই অঞ্চলের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে একটি রূপরেখা হাজির করা হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ সময়কালে গ্রাম ও শহরের শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এই লেখায় অর্থনীতির গতিমুখ, শিল্প খাতে ধরনের সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বেশি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উত্তর গ্রাম ও শহর

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে যে শ্রেণীকাঠামো তৈরি হয়, সেখানে জমিদার-জোতদার আর রায়ত ছিল প্রধান দুই জনগোষ্ঠী। এছাড়া ছিল উকিল, কেরানি, পুলিশ। ১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র খাজনা আদায়ের একক অধিকারী হয়। জমিদারি প্রথা বাতিল হয়। কৃষকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সে সময় পূর্ববঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল না। সুতরাং শিল্প মালিক বুর্জোয়া ও শিল্প শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্বও প্রায় ছিল না বললেই চলে। কৃষি ও কৃষিভিত্তিক তৎপরতাই ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান পরিচয়। তাঁত, পাট বেলিং, গুড়, বিড়িসহ কুটির শিল্প ছিল প্রধান অকৃষি তৎপরতা। শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছিল হাতে গোনা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিলের তুলনায় শ্রেণী গঠনে অধিক প্রভাব সৃষ্টি হয় দেশভাগে সৃষ্ট সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে জমিদাররা ছিলেন প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাঁদের জমিদারি বাতিলের আগেই দেশভাগসৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে তাঁদের অনেকেই ভারতে চলে যান। শুধু হিন্দু জমিদার নয়, দেশভাগের সহিংসতা ও অনিশ্চয়তায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী একটি বড় অংশ সে সময় দেশত্যাগ করে; তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্কুল-কলেজের শিক্ষক, আইনজীবী, সরকারি কর্মকর্তা।

পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এই অঞ্চলে শহুরে মধ্যবিত্ত ছিল খুবই

ক্ষুদ্রায়তন। দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশাসন, ওকালতি ও সাংবাদিকতায় যাঁরা প্রাধান্যে ছিলেন, তাঁদের বৃহৎ অংশ ভারতে চলে যাওয়ার পর সেই শূন্যস্থান পূরণের মধ্য দিয়ে একটি নতুন জনগোষ্ঠী তৈরি হয়। দৃষ্টিগ্রাহ্য আকারে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের এভাবেই যাত্রা শুরু। প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে বাঙালির প্রতি বৈরী নীতিমালা থাকার কারণে এরপর মোকাবেলা করতে হয় পাঞ্জাবিদের। এবং যোগ্যতা থাকলেও সুযোগ না পাওয়ার বঞ্চনাবোধ ক্রমে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে পরবর্তী দশকের নতুন ভূমিকা পালনের জন্য তৈরি করতে থাকে।

পঞ্চাশের দশক থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানের এই পূর্বাংশে কিছু বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকে। এর মধ্যে পাটকল অন্যতম। এ ছাড়াও ছিল চিনিকল, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, স্টিল ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি। এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমে একটি শিল্প শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম, টঙ্গীসহ দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে শিল্পভিত্তিক নগরী গড়ে ওঠে। ষাটের দশকের মধ্যে একই সঙ্গে শিল্প শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন ও রাজনীতিও ক্রমে দানা বাঁধে। সামরিক শাসন ও স্বৈরতান্ত্রিক বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন-আন্দোলন ঠেকানোর চেষ্টা খুব জোরদার ছিল। তা হলেও সামরিক শাসনবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন পরস্পরকে শক্তি জোগায় এবং একপর্যায়ে স্বৈরশাসনকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা (নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী) এবং চট্টগ্রাম শিল্প এলাকার শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার ওপর আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে ছাত্র ও মধ্যবিত্তের বিভিন্ন অংশের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়, ফলে অসন্তোষও দানা বাঁধতে থাকে। এই সময়ে আইয়ুবি স্বৈরশাসনের পাশাপাশি সমগ্র পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলাতেও রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়ে। নির্মাণ, ব্যবসা, ওকালতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, হাসপাতাল, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রসারের মধ্য দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের আয়তন তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। যাঁরা নিজেদের অধিকতর পদোন্নতি, বিত্ত, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির পথে বাধা হিসেবে পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিকেই শনাক্ত করছিলেন। কারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্য সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটলেও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা সবই অটুট ছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো জোরদার হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিলের পর কৃষক সমাজে বড় আকারের পরিবর্তনের ঢেউ আসে ষাটের দশকের শেষার্ধে। ১৯৬১ সালে আইয়ুব খান যে ভূমি সংস্কার করেছিলেন, তা ১৯৫০ এর ভূমি সংস্কার নির্দেশিত ১০০ বিঘা জমির সিলিং বাতিল করে। এবং সীমা বাড়িয়ে তা নির্ধারণ করে ৩৭৫ বিঘায়। জমির সিলিং তিন গুণেরও বেশি বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোতে কিংবা কৃষক সমাজের বিন্যাসে তা উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তনের ছোঁয়া দিতে পারেনি। এর মূল কারণ হলো, ১৯৫০ এ ১০০ বিঘা জমির সিলিং নির্ধারিত হলেও বাস্তবে জোতদার পরিবারগুলোর দখলে এর তুলনায় বহুগুণ বেশি জমি আগে থেকেই ছিল। কোনো কোনো পরিবারে সহস্রাধিক বিঘা জমিও ছিল। সুতরাং আইয়ুব খানের ভূমি সংস্কারে বর্ণিত ভূমি সিলিং কার্যত বাস্তবে যা বেআইনি ছিল, তাকেই বৈধতা দেয়।

ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে বেশ কিছু নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদান গ্রামাঞ্চলে সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক তৎপরতা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা–সর্বোপরি শ্রেণীবিন্যাসে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন আনে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র' এবং 'সবুজ বিপ্লব'। এছাড়া অবকাঠামোগত পরিবর্তনও বিশেষ ভূমিকা রাখে। 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র' নামের একটি কর্মসূচির সূচনা করেন পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান। গ্রামাঞ্চলে পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সামরিক-বেসামরিক শাসকগোষ্ঠীর স্থায়ী প্রভাববলয় সৃষ্টির জন্য ব্যাপক আয়োজনের সুপরিকল্পিত অংশ ছিল এটি। এটা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো একটি ব্যবস্থা, যেখানে একটি লুম্পেন জমিদারগোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে তারা নিজেদের স্বার্থেই ইংরেজ শাসন টিকিয়ে রাখবে। পাকিস্তানে তৈরি করার চেষ্টা হলো রাষ্ট্রের অনুগ্রহপুষ্ট দুর্নীতির জালে বন্দি স্থানীয় প্রতিনিধিদের একটি গোষ্ঠী। এঁরা হলেন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও চেয়ারম্যান। ঠিক হলো– জনগণ নয়, এঁদের ভোটেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।

সে অনুযায়ী, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের হাতে তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়। 'পাবলিক ওয়ার্কস' বা গণপূর্ত কর্মসূচিতে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হয়, যার মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামোরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের বহু গ্রাম বা নিকটবর্তী এলাকা সে সময়ই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড নির্মিত পাকা রাস্তায় যুক্ত হয়। আগের তুলনায় গ্রাম শহরের নিকটবর্তী হয়, সড়কপথে মানুষ ও পণ্য পরিবহন ব্যবস্থারও সম্প্রসারণ ঘটে। চেয়ারম্যানদের মাধ্যমেও অনেক টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়–ছোট কালভার্ট, হাটবাজার উন্নয়ন, গ্রামের রাস্তা নির্মাণ বা উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে। এসব টাকা-পয়সা অডিট করার চাপ থেকে মুক্তি দিয়ে আইয়ুব খান চেয়ারম্যানদের হাতে অর্থবিত্তের নতুন উৎস ধরিয়ে দেন। এগুলো করা হয় সমর্থন ভিত্তি তৈরি করার জন্যই।

> চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিলের তুলনায় শ্রেণী গঠনে অধিক প্রভাব সৃষ্টি হয় দেশভাগে সৃষ্ট সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে।

এই সময়কালেই জমির মালিকানা ছাড়াও নগদ অর্থ ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আরো স্পষ্ট রূপ নেয়। দুর্নীতি, রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রামসহ অবকাঠামো উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (বিডি চেয়ারম্যান) ও সদস্যদের (বিডি মেম্বার) ক্ষমতা, বিত্ত ও যোগাযোগ অনেক সম্প্রসারিত হয়। এদের বৃহৎ অংশই আইয়ুবি স্বৈরশাসনের শক্তিশালী গ্রামীণ খুঁটি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে এবং সেভাবেই তাদের পরিচিতি দাঁড়ায়। একই কারণে আইয়ুবি স্বৈরশাসনবিরোধী লড়াই যখন গ্রামীণ পর্যায়ে বিস্তৃত হয়, তখন বিডি মেম্বার ও চেয়ারম্যানরা ক্রমে আন্দোলনের পরিষ্কার শত্রুপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হন।

বাজার অর্থনীতি সে সময় ছিল অনেক সীমিত, ব্যবসার ক্ষেত্রও ছিল বর্তমানের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। গ্রামের বেশির ভাগ পরিবার ছিল আত্মপোষণশীল খানা। বাজারের জন্য উৎপাদন ছিল খুব সীমিত আকারে, আর বাজারমুখী উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যাও ছিল খুব সীমিত। এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই শুরু হয়। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে

তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব'। এ বিষয়ে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ফাউন্ডেশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও ইউএসএইড। ফিলিপাইনের 'আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান' বা 'ইরি' কর্তৃক ইরি বীজ নিয়ে কৃষি খাতের বহুজাতিক সংস্থাগুলোর আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। কারণ এই উচ্চফলনশীল বা উফশী বীজ ব্যবহারের সাথে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে যুক্ত ছিল কীটনাশক ওষুধ, রাসায়নিক সার ও যান্ত্রিক সেচের ব্যবহার। এগুলোর মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী অনুন্নত দেশগুলোতে কৃষিসামগ্রীর বিরাট বাজারের সম্ভাবনা দেখা যায়। সুতরাং এই বীজ চালু করার পক্ষে মনসান্টো, কারগিলসহ বহুজাতিক কৃষি সংস্থা, স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল, ইউএসএইড, বিশ্বব্যাংক, শিক্ষা-গবেষণা প্রতিষ্ঠান আর সেই সঙ্গে মার্কিনসহ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করানোর জন্য সামরিক শাসন খুব সুবিধাজনক ছিল। আইয়ুব খানের প্রশাসন এই কাজে সক্রিয় হয়। তৎকালীন ইপিএডিসির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এ কাজেই লাগানো হয়। বলা যায়, এই প্রতিষ্ঠানের ওপর ভর করেই 'সবুজ বিপ্লবের' কর্মসূচি কার্যকর হয়। আমদানীকৃত বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ, সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ শুরু হয়।

এই সময়ই মুনাফা ও বাজারকে লক্ষ্য করে কৃষি উৎপাদন গতি লাভ করে; যার প্রভাব কৃষি খাতের মালিকানা, বিনিময় সম্পর্ক এবং বাজার ব্যবস্থা– সব কিছুতেই পড়ে। গ্রামীণ বাজার সম্প্রসারিত হয়। নতুন নতুন পেশাও তৈরি হয়। সড়কপথের বিস্তৃতি শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে বাজারের সীমা সম্প্রসারণ করে। কিন্তু এর মধ্যে ভূমিহীনদের সংখ্যাও বাড়ে। ষাটের দশকের শেষ নাগাদ গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনের হার দেখা যায় শতকরা ৩৩ ভাগ। অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের আনুপাতিক হার ছিল উচ্চমাত্রায়, ফলে বর্গাচাষও ছিল উল্লেখযোগ্য। ষাটের দশকের শেষভাগে আইয়ুবি স্বৈরশাসন, পাকিস্তানি বৈষম্য ও নিপীড়নবিরোধী আন্দোলনের যে বিস্তৃতি ঘটে, সেখানে গ্রামীণ সমাজের নতুন পেশাজীবী, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ সমাজে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের সংগঠিত করায় বামপন্থী কৃষক সংগঠনের ভূমিকা ছিল প্রধান। দাবিগুলোর মধ্যে খোদ কৃষকের হাতে জমি, পাটের নগদ দাম ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

> সামরিক শাসনবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন পরস্পরকে শক্তি জোগায় এবং একপর্যায়ে স্বৈরশাসনকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা (নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী) এবং চট্টগ্রাম শিল্প এলাকার শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ষাটের দশকে শ্রমিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ

পঞ্চাশের দশক থেকে শিল্প খাতে যে নতুন প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে, তার মধ্যে দু-একটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া সবগুলোরই মালিকানা ছিল আদমজী-বাওয়ানীসহ পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক কয়েকটি বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর। তার ফলে শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণীগত সংগ্রাম ও জাতিগত বৈষম্য-নিপীড়নবিরোধী সংগ্রাম একাকার হয়ে যেতে সময় লাগেনি। তেভাগা আন্দোলনের একপর্যায়ে বাঙালি মুসলমান কৃষক ও হিন্দু জমিদারের শ্রেণীগত লড়াইকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে নিয়ে যাওয়া মুসলিম লীগের পক্ষে খুব সহজ হয়েছিল; কেননা ধর্মীয় বৈষম্য ও নিপীড়ন আসলেই জোরদারভাবে সমাজে উপস্থিত ছিল। তেমনি বাঙালি শ্রমিক ও অবাঙালি মালিকের শ্রেণীগত সংঘাতের লড়াইও জাতীয়তাবাদী স্রোতে টেনে নেওয়া সম্ভব হয় জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্যের বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই। গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও ভূমিহীনদের সামনে বাঙালি জোতদার শাসকরা থাকলেও পাকিস্তানি বৈষম্যমূলক নীতি, পাট ও চিনি নিয়ে কেন্দ্রীয় নীতি গ্রামীণ শ্রেণীদ্বন্দ্বকে আড়াল করে ফেলেছিল। বিডি মেম্বার ও চেয়ারম্যানরা যতটা শ্রেণীগত শত্রু হিসেবে স্পষ্ট ছিলেন, তার চাইতে অনেক বেশি ছিলেন আইয়ুব খান বা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ক্রমশ জাতীয়তাবাদী ধারার হাতে চলে যাওয়ার ফলে শ্রেণীর সংগ্রাম ও মতাদর্শ তার সাথে শুধু একাকার হয়নি, কার্যত তার অধস্তন হয়ে পড়ে।

সেজন্য ষাটের দশকে শ্রমিকশ্রেণীর এবং বৃহত্তর অর্থে গ্রাম শহরের শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহের বস্তুগত গঠন যা হয়েছিল, তার রাজনৈতিক চেতনাগত রূপান্তর সেভাবে ঘটেনি। এই রাজনৈতিক চেতনা গঠনে বামপন্থীদের দায়িত্বই ছিল প্রধান, সেই ভূমিকাও কার্যকর হতে পারেনি বিভিন্ন কারণে। ভাষা আন্দোলন, আঞ্চলিক বৈষম্য, নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শিক অবস্থান শক্তিশালী এবং লড়াই সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল বরাবরই মুখ্য। যদিও এসবের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান ভিত্তিও কার্যত বামপন্থীরাই গঠন করেন; কিন্তু তা দ্রুত বাঙালি উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী দর্শন ও সংগঠনের অধীনস্থ হয়।

এ রকম পরিস্থিতিতে বেপরোয়া হয়ে বামপন্থীদের একাংশ ১৯৭০ সাল থেকে শ্রেণীপ্রশ্নকে যেভাবে জনমনে আনতে চেষ্টা করে, তা ফলপ্রসূ হয়নি। একাংশ যখন জাতীয়তাবাদী ধারার অধীনস্থ হয়ে পড়ে, অন্য অংশ তখন শ্রেণীপ্রশ্ন প্রাধান্যে আনতে গিয়ে জাতিগত নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন তার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে ব্যর্থ হয়। চেষ্টা করতে গিয়ে এদের মধ্যে আরো ভাঙন আসে। চারু মজুমদারের লাইন গঠনের প্রক্রিয়ায় একটি ধারার জনসম্পৃক্ততার বদলে জনবিচ্ছিন্নতাই বৃদ্ধি পায়। শ্রেণীশত্রু খতম ক্রমে ব্যক্তিহত্যা ও আত্মঘাতী সংঘাতে রূপ নেয়। ডান ও বাম উভয় প্রবণতা বিপ্লবী রাজনীতির মধ্যে দিশেহারা ও বিলোপবাদী পরিস্থিতি অনিবার্য করে তোলে। এবং বামপন্থীরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে তাই সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রেণীপ্রশ্ন একেবারেই প্রান্তিক হয়ে পড়ে। তার পরও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে ক্রমে এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছিল। জনমনে অন্তত এই বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল যে পাকিস্তানের ধারাবাহিকতার একটি রাষ্ট্র বাংলাদেশে স্থাপিত হবে না। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একটি তরল চিন্তা তৈরি হয়েছিল তখন।

সে সময় চলছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধ। কিউবা বিপ্লব ও মার্কিন একটানা আগ্রাসনের মুখে তার টিকে থাকা বিশ্বব্যাপী তখন নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র তখন ভিয়েতনাম দখলে রাখতে গিয়েও নাস্তানাবুদ হচ্ছিল। সারা বিশ্বের জন্যই ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিল বিশাল এক অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার বিষয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই দুর্বল দরিদ্র দেশটিকে দখল করতে গিয়ে বিশ্বের সর্বাধুনিক সকল অস্ত্র ব্যবহার করেছে, লাখ লাখ সৈন্য মোতায়েন করেছে, নিয়মিত সৈন্যে ঘাটতি পড়ায় মার্কিন তরুণদের একরকম বাধ্য করেছে যুদ্ধে যোগদানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেসব বোমা ব্যবহার করা হয়েছে, তার চাইতেও বেশি পরিমাণ বোমা ফেলা হয়েছে ভিয়েতনামের গ্রামে, শহরে, আবাসিক এলাকায়, ধর্মীয় স্থানে,

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, হাসপাতালে। এসব করেও গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বিষয়ক একটানা মিথ্যাচার অব্যাহত ছিল।

কিন্তু এতসব করেও বিজয়ের ধারেকাছেও যেতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। নিরক্ষর অনাহারী নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ তাদের তরুণদের পাশাপাশি নিজ নিজ শক্তি, অস্ত্র আর কৌশল দিয়ে অভাবিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তাদের লড়াই, চেতনা, মনোবল এবং নতুন সমাজের স্বপ্ন সারা বিশ্বকেই উদ্দীপ্ত করত। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেরও লাখ লাখ মানুষ ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধিতা করতে করতে নতুন চৈতন্য ও রাজনীতির দীক্ষা নিয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ যখন ১৯৭১ সালে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে যুদ্ধে নেমেছে, তখন ভিয়েতনাম সামনে ছিল অপরাজেয় জনশক্তির একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে। সে সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণদের অনেকে যে বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে বসে চীনের জনযুদ্ধ, ভিয়েতনামে গেরিলা যুদ্ধ, কিউবার সফল সশস্ত্র সংগ্রাম নিয়ে লেখালেখি বা অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন করেছেন, নতুন চেতনায় নিজেদের তৈরি করেছেন, তার সাক্ষ্যও আমরা পাই। এগুলো শুধু লড়াইয়ের পদ্ধতি শিক্ষার বিষয় ছিল না, এর মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি রূপকল্পও তৈরি হচ্ছিল। বৃহত্তর অর্থে সেটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের চিন্তা। ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন, সবার জন্য কাজ-অন্ন-বস্ত্রের অধিকার নিশ্চিত করা, পাটের ন্যায্য মূল্য, জাল যার জলা তার, সর্বজনীন শিক্ষা ও চিকিৎসা, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য থেকে মুক্তি ইত্যাদি তখন যুদ্ধক্ষেত্রের তরুণদের অনেকের মধ্যেই অঙ্গীকারের বিষয়।

ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে বেশ কিছু নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদান গ্রামাঞ্চলে সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক তৎপরতা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা—সর্বোপরি শ্রেণীবিন্যাসে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন আনে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র' এবং 'সবুজ বিপ্লব'।

বাংলাদেশের সূচনাপর্ব

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তার শ্রেণীভিত্তি যে শিল্পবুর্জোয়া ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। অনুপস্থিত ভূস্বামী, গ্রামীণ জোতদার ও ধনী কৃষক, শহরাঞ্চলে উকিল-শিক্ষকসহ নতুন পেশাজীবী, ঠিকাদারসহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী– এরাই আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বের এবং সমর্থকদের প্রধান শ্রেণীগত ভিত্তি ছিল। মাইকেল কালেকি এ রকম শ্রেণীভিত্তি নিয়ে সরকার গঠনের অনেকগুলো দৃষ্টান্ত আলোচনা করে এ ধরনের সরকারের নাম দিয়েছিলেন 'ইন্টারমিডিয়েট রেজিম'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর সময়কাল নিয়ে রেহমান সোবহান ও মুজফফর আহমদ এই নামেই এ বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি গ্রন্থ (সোবহান ও আহমদ, ১৯৮০) লিখেছেন।

কিন্তু বাঙালি উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্র নিয়েই বাংলাদেশ তার যাত্রা শুরু করে। এই শ্রেণীর দ্রুত বিকাশের চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হতে গিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থায় তৈরি হয় অস্থিরতা, সংঘাত ও অনিশ্চয়তা। শ্রেণীবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিবর্তনের সূচনা সে সময়ই।

শ্রেণীগত দুর্বল ভিত্তি এবং নতুন গতিমুখ সৃষ্টিতে অনীহা ও অক্ষমতার কারণেই নতুন বাঙালি শাসকশ্রেণী প্রথম থেকেই কোনো স্থিতি পায়নি। যখন ভিন্ন গতিমুখ সৃষ্টির সম্ভাবনা নিঃশেষ হতে থাকে, সেই তরল অবস্থায় ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী নতুন বিত্তবান শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। সরকার, সর্বোপরি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তায় সবচাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি শেখ মুজিবের ক্ষেত্রে একে একে আমরা পশ্চাদপসরণ দেখি। অগ্রসর হয় নতুন ধনিক শ্রেণী গঠনের প্রক্রিয়া, যার ভিত্তি ছিল মূলধনের আদিম সংবর্ধন। শাসকশ্রেণির গঠনেও তাই আমরা পরিবর্তন দেখতে থাকি। এই শ্রেণীর গঠন ও পুঁজির গতি-প্রকৃতির সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণি ও বৃহত্তর শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকাও পরিবর্তিত বা পুনর্গঠিত হয়।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন বাঙালি কোটিপতির সন্ধান পাওয়া কঠিন ছিল। খুঁজলে দু-তিন পরিবার হয়তো পাওয়া যেত। চার দশক পর বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা কমপক্ষে ৩০ হাজার। শত হাজার কোটি টাকার মালিক পরিবারও এখন বাংলাদেশে আছে। এই কোটিপতি শ্রেণী সৃষ্টির প্রক্রিয়া দ্বান্দ্বিকভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার ধরন নির্ধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ছক-১ এ গত বিশ শতকের (১৯০১-২০০০) বিভিন্ন পর্বে বাংলাদেশের প্রধান শ্রেণীগুলো আর তার সঙ্গে প্রধান রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, প্রধান রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও প্রধান সামষ্টিক প্রতিরোধের ঘটনাবলির একটি সারসংক্ষেপ উপস্থিত করা হয়েছে।

শিল্প খাতের ধারা, মালিক ও শ্রমিকশ্রেণী

স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশ পাকিস্তানের যে শিল্প খাত লাভ করে, তার প্রধান অংশের মালিক ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী আদমজী, বাওয়ানী প্রভৃতি। আগেই বলেছি, পঞ্চাশের দশক থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল মুখ্য। পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইপিআইডিসি) মালিকানায় কিংবা তার অংশীদারত্বে বৃহৎ কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। নিচের ছকে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার আগে ৩০৫১টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদিও সংখ্যার দিক থেকে ২২৫৩টির মালিক ছিলেন বাঙালি, এর আর্থিক মূল্য ছিল শতকরা মাত্র ১৮ ভাগ। অন্যদিকে অবাঙালি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭২৫টি হলেও তার আর্থিক মূল্য ছিল শতকরা ৪৭ ভাগ। আর শতকরা যে ৩৪ ভাগ ইপিআইডিসির মালিকানায় ছিল, সেগুলোর বেশির ভাগও অবাঙালি বৃহৎ মালিকদের হাতেই যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশি। অবাঙালি ও ইপিআইডিসি মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো মিলে দাঁড়ায় শতকরা ৮১ ভাগ, এর কয়েকটি বাদ দিয়ে বাকিগুলো পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়, এর সঙ্গে যোগ হয় কতিপয় বাঙালি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। সব মিলিয়ে শিল্প খাতের শতকরা ৯২ ভাগ সম্পদ নিয়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মূল ভিত্তি তৈরি হয়। বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা, বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থা, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা নামে ছয়টি সংস্থার অধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিন্যস্ত করা হয়।

১৯৭২ থেকে শিল্প খাতে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের এই প্রাধান্যের কারণে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এই খাত ঘিরেই শ্রমিক সংগঠনগুলো প্রধানত কাজ করতে থাকে। ষাটের দশকের ধারাবাহিকতায় নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, চট্টগ্রাম ও খুলনায় শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা ছিল বাম সংগঠনগুলোর। বৃহৎ শিল্প এবং সেই কারণে একই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের সমাবেশ সরকারের জন্য সব সময়ই উদ্বেগের বিষয় ছিল। সরকারি দলের

ছক ১ : বিশ শতকের তিনটি সময়কালে শ্রেণীসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক

ক্ষেত্র	১৯০১-৪৭	১৯৪৭-৭১	১৯৭২-২০০০
প্রধান শ্রেণীসমূহ	জমিদার, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পেশাজীবী, রায়ত কৃষক	জোতদার, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পেশাজীবী, বুনিয়াদি গণতন্ত্রী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, শিল্প ও কৃষি শ্রমিক	বৃহৎ ব্যবসায়ী ও ব্যাংক-শিল্প মালিক, চোরাই কোটিপতি, উচ্চ আয়ের পেশাজীবী, এনজিও মালিক, সীমিত আয়ের পেশাজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, বাণিজ্যিক (মৎস্য, ফল, মুরগি), খামারের মালিক, কৃষি ও অকৃষি শ্রমিক, শিল্প শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, নারী শ্রমিক, দোকান শ্রমিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ক্ষুদ্র ব্যবসার শ্রমিক
প্রধান সংস্কার বা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ	নতুন নির্বাচনী ব্যবস্থা ১৯৩৫	জমিদারি প্রথা বাতিল (১৯৫০), ভূমি সংস্কার, (১৯৬১-৬২). পারিবারিক আইন (১৯৬২). 'সবুজ' বিপ্লব, বুনিয়াদি গণতন্ত্র	নতুন সংবিধান (১৯৭২) চার মূলনীতি : গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ। ভূমি সংস্কার (১৯৭২, ১৯৮৪), প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ও একদলীয় শাসনব্যবস্থা বাকশাল প্রবর্তিত (১৯৭৫), বাকশাল ব্যবস্থা বাতিল, (১৯৭৫), সামরিক শাসন (১৯৭৫, ১৯৮২), ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অনুমোদিত (১৯৭৫), সংবিধানের ধর্মীয়করণ (১৯৭৫), রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম (১৯৮৮), কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান, উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (১৯৯৩, ১৯৯৭), তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার শুরু (১৯৯১), পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি (১৯৯৭)
প্রধান দুর্যোগসমূহ	১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এবং ১৯৪৭ এর ভারত ভাগ কেন্দ্র করে ব্যাপক গণহত্যা ও দেশত্যাগ	কাপ্তাই বাঁধ (১৯৬৬), বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা (১৯৬৯), জলোচ্ছ্বাস (১৯৭০)	দুর্ভিক্ষ (১৯৭৪, ১৯৭৯), বন্যা (১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮), জলোচ্ছ্বাস (১৯৮৬, ১৯৯১), ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপর সাম্প্রদায়িক সহিংসতা (১৯৮৮, ১৯৯২), আর্সেনিক (১৯৯৭...)
প্রধান রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন	জমিদারি শাসন, তেভাগাসহ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পুলিশ-জমিদারি নিপীড়ন	বামপন্থীদের ওপর নির্যাতন, খাপড়া ওয়ার্ডে গুলি, ভাষা আন্দোলন বিরোধী অভিযান, সামরিক শাসন (১৯৫৮-৬৮), পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, গণ-নারী নির্যাতন (১৯৭১)	বামপন্থীদের ওপর নির্যাতন, রক্ষীবাহিনী, বিচারবহির্ভূত রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড শুরু (১৯৭৩...), জরুরি অবস্থা (১৯৭৪, ১৯৮৭), সামরিক শাসন (১৯৭৫, ১৯৮২), পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকীকরণ (১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮৯...), অধিকার দাবির কারণে শ্রমিক-কৃষক হত্যা (১৯৯৫)
প্রধান সামষ্টিক প্রতিরোধ	ব্রিটিশবিরোধী সহিংস ও অহিংস আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন	পুলিশ বিদ্রোহ (১৯৪৮), ভাষা আন্দোলন (১৯৫২), সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন (১৯৬২...), কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন-ঘেরাও, গ্রামাঞ্চলে গণ-আদালত (১৯৬৮-৬৯), গণ-অভ্যুত্থান (১৯৬৯), স্বাধীনতাযুদ্ধ (১৯৭১)	বেসামরিক ও সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন (১৯৭৩-৭৪, ১৯৭৯-৮১, ১৯৮৩-১৯৯০, ১৯৯১-২০০০), সিপাহি বিদ্রোহ (১৯৭৫), শ্রমিক আন্দোলন (১৯৮৪, ১৯৮৭, ১৯৯০), কৃষক আন্দোলন (১৯৮৭), সামরিক শাসন বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান (১৯৯০), যুদ্ধাপরাধীবিরোধী আন্দোলন (১৯৯২...), পার্বত্য চট্টগ্রামে বিসামরিকীকরণ, গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক স্বীকৃতির লড়াই (১৯৭৪....), ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে স্থানীয় বিদ্রোহ, (১৯৯৪), আনসার বিদ্রোহ (১৯৯৫), যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন (১৯৯৭...), জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলন (১৯৮৭, ১৯৯৮....)

শ্রমিক সংগঠন দিয়ে বৃহৎ কারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন দখল শুরু হয় স্বাধীনতার পরপরই। এরপর সরকার পরিবর্তন হয়েছে অনেক, কিন্তু যারাই ক্ষমতায় এসেছে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানায় তাদেরই তথাকথিত শ্রমিক সংগঠনের আধিপত্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

সরকার-নির্বিশেষে সরকারি দলের এই আধিপত্য নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়েছে নানা কূটচাল, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মধ্য দিয়ে। বামপন্থী অনেক নেতার সাথে সাথে ট্রেড ইউনিয়নের অনেক পুরনো নেতা বিভিন্ন সরকারের আমলে সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনে যোগ দিয়ে এর শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। দুর্নীতি ও নানা অনিয়মের কারণে এসব সংগঠনের প্রকৃত শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ভূমিকা আর অবশিষ্ট থাকেনি। এসব সংগঠন পরিণত হয়েছে সরকারি দলের বিভিন্ন স্বার্থরক্ষা কিংবা তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যমে।[২]

ছক ২ : স্বাধীনতার আগে ও পরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকানা বিন্যাস

১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ পরিস্থিতি	সংখ্যা	মূল্য (কোটি টাকা)	অনুপাত (%)
ইপিআইডিসির মালিকানা	৫৩	২০৯৭	৩৪
অবাঙালি ব্যক্তিমালিকানা	৭২৫	২৮৮৫.৭	৪৭
বাঙালি ব্যক্তিমালিকানা	২২৫৩	১১১৮.৮	১৮
বিদেশি ব্যক্তিমালিকানা	২০	৩৬	১
মোট	৩০৫১	৬১৩৭	১০০
২৬ মার্চ ১৯৭২ এর পরিস্থিতি			
সাবেক ইপিআইডিসির মালিকানাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	৫৩	২০৯৭	৩৪
পরিত্যক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প+রাষ্ট্রায়ত্ত বিদেশি মালিকানাধীন শিল্প	২৬৩+১	২৬২৯.৭	৪৩
রাষ্ট্রায়ত্ত, বাঙালি ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প	৭৫	৯১০.৮	১৫
মোট রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	৩৯২	৫৬৩৭.৫	৯২

উৎস: সোবহান ও আহমদ, ১৯৮০

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমাজতন্ত্রের চিহ্ন হিসেবে বরাবর দাবি করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানগুলোই নব্য ধনিক শ্রেণী গঠনের আদি প্রধান অবলম্বন ছিল। এসব শিল্পকারখানায় দুর্নীতি ও লোকসানের প্রধান কারণ ছিল এখানেই। রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বিরোধী সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি, উপরন্তু বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এই খাতকে দুর্বল ও অকার্যকর করার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ তৈরি করার মতো এসবে তাই শ্রমিকদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তিও ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

নব্য ধনিক শ্রেণীর গঠন সরকারের আনুষ্ঠানিক নীতি পরিবর্তনেও ক্রমান্বয়ে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তার সঙ্গে যোগ হয় আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ/চাপ। ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ ও এডিবি পুনরায় বাংলাদেশে তাদের প্রভাব-কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হয়। শুরু হয় ঋণ, অনুদান, প্রকল্প বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের সমর্থক গোষ্ঠী তৈরির প্রক্রিয়া, আর বিভিন্ন খাতে পাকিস্তান আমলের পুরনো অর্থনৈতিক নীতির পুনঃস্থাপন। বিনিয়োগসীমা বাড়তে থাকে, বিরাষ্ট্রীয়করণও শুরু হয় ১৯৭৪ থেকেই। বাঙালি নব্য ধনিক শ্রেণীর আয়তন, প্রভাব ও দাবিদাওয়া বাড়তে থাকে।

১৯৭৫ এর সামরিক শাসনের পর এই শ্রেণীর সামনে রাষ্ট্রীয় নানা অঙ্গীকারের বাধা অপসারিত হয়। মূলধনের সংবর্ধন বিনিয়োগসীমা বৃদ্ধিরও তাগিদ সৃষ্টি করে, একপর্যায়ে সিলিং তুলে নেওয়া হয়। এর পাশাপাশি অর্থসংস্থানের জন্য বাঙালি ধনিক শ্রেণীর কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো খুলে দেওয়া হয়। '৮২-র সামরিক শাসনের পর এই ধনিক শ্রেণী আরো সংহত হয়। দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন অভূতপূর্ব মাত্রা লাভ করে, এগুলোর মধ্য দিয়ে বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী সংহত রূপ লাভ করে। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রসহ তারাই তখন রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান ভিত্তি। এই দশকেই 'কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি' (structural adjustment programme) নামে একটি সামগ্রিক নীতি-কাঠামোতে রাষ্ট্র প্রবেশ করে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকার 'নয়া উদারতাবাদী' নীতি অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার বিস্তার, বাণিজ্যের অবাধকরণ, মানুষের অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস ইত্যাদি কার্যক্রম নিতে থাকে। এই নীতি-কাঠামোর অংশ হিসেবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দেওয়া, শিল্প ইউনিটগুলো ছেঁটে ফেলা, লোকসানি প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকসান বন্ধ করার চেষ্টা না করে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা, শ্রমিকজনিত ব্যয় সংকোচন করার জন্য ছাঁটাই, তথাকথিত 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক' ইত্যাদি ছিল একের পর এক বিভিন্ন সরকারের 'অর্থনৈতিক সংস্কারের' প্রধান দিক। এসব পুনর্গঠন নীতির ফলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো সংকুচিত হতে থাকে, ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরিত অনেক প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায়, বিশিল্পায়ন প্রক্রিয়া জোরদার হয়। এর ফলে বাড়তে থাকে বেকারত্ব। এ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ২০০২ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জুট মিল আদমজী বন্ধের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানটি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয় বিশ্বব্যাংকের পাট খাতের উন্নয়নের নামে ২৫ কোটি ডলারের ঋণযুক্ত 'জুট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট'-এর অধীনে।[৩]

শুধু শিল্পকলকারখানা নয়, সকল সাধারণ সম্পত্তি মুনাফামুখী তৎপরতার অধীনস্থ করার জন্য বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি আসতে থাকে। ১৯৯৫ এর পর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নানা চুক্তি এই ধারাকে আন্তর্জাতিক বিধি দ্বারা পুষ্ট করে। এগুলো 'নয়া উদারনৈতিক' (কার্যত 'নয়া রক্ষণশীল') দর্শন নামেই বিশ্বব্যাপী পরিচিত। কখনো পিআরএসপি, কখনো পরিকল্পনাসহ নানা ব্যানারে এই দর্শন অনুযায়ীই রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে।

এই নীতি ও সংস্কার প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক মাত্রাটিও গুরুত্বপূর্ণ। এসব কাজ শুধু যে পুরনো বৃহৎ শিল্পকারখানাগুলোকে অপসারণ করে ব্যক্তি পুঁজির সম্প্রসারণের জন্যই করা হয়েছে তা নয়। বরং এটা এখন স্পষ্ট যে এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল একক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের বৃহৎ সমাবেশ ও তাদের ঐক্যের সুযোগ ভেঙে দেওয়া। অধিকন্তু শ্রমিক ঐক্য ও সংহতি ভাঙতে, তাদের অধিকার আদায়ের সক্ষমতা নষ্ট করে কম মজুরি গ্রহণে বাধ্য করতে নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। সেজন্য এর পরও আমরা ব্যক্তিমালিকানায় পাটকল স্থাপন হতে দেখি, কিন্তু সেখানে শ্রমিক নিয়োগ হতে থাকে চুক্তিভিত্তিক।

ভাষা আন্দোলন, আঞ্চলিক বৈষম্য, নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শিক অবস্থান শক্তিশালী এবং লড়াই সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল বরাবরই মুখ্য।

এসব নীতি-কাঠামোর অধীনে ১৯৮৮ পর্যন্ত ১০৭৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়, যার মধ্যে ৬০৯টি শিল্প খাতের। এরপর ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ৪৪৯টি এবং ২০০০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টিল মিলসহ ৬২১টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয় করা হয়। ২০১০ সাল পর্যন্ত আদমজী পাটকলসহ আরো বড়-ছোট-মাঝারি অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হয় বন্ধ অথবা বিরাষ্ট্রীয় করা হয়। এর মধ্য দিয়ে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং অর্থসংস্থান–সব বিবেচনায়ই রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অনুপাত অনেক সংকুচিত হয়ে পড়ে। ১৯৭৮, ১৯৮২, ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালে যেসব শিল্পনীতি ঘোষিত হয়, সেগুলো মোটামুটি একরৈখিকভাবে ব্যক্তিমালিকানা, রপ্তানিমুখী ও বিদেশি মালিকানার পক্ষে নানা নীতি ও প্রণোদনা ঘোষণা করে। প্রণোদনাগুচ্ছের মধ্যে ছিল–বিভিন্ন রকম ভর্তুকি, অবকাঠামো সমর্থন, কর মওকুফ, অর্থসংস্থানে সমর্থন, শুল্কমুক্ত আমদানি ও দেশের বাইরে অর্থ প্রেরণের সুবিধা ইত্যাদি। ১৯৭৮ সাল থেকেই একই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় অনেক সুবিধা দিয়ে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) প্রতিষ্ঠা শুরু হয়।[৪]

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে প্রধান ও বৃহৎ কারখানা ছিল স্টিল, পাট, কাগজ, সার ও চিনি শিল্প। হয় বন্ধ অথবা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর, সংকোচন অথবা নীতি বা দুর্নীতির মাধ্যমে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রক্রিয়া সরকার-নির্বিশেষে অব্যাহত থাকে। আগেই বলেছি, আশির দশক থেকে ব্যক্তিমালিকানায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। সত্তরের দশকের শেষ থেকে এবং বিশেষভাবে আশির দশকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে ঋণখেলাপি হয়ে দাঁড়ায় মূলধন গঠন ও সংবর্ধনের বড় অবলম্বন। বস্তুত এই ঋণখেলাপিরাই বাঙালি নব্য ধনিক শ্রেণীর ভিত্তি স্থাপন করে। তারাই ক্রমে মালিক হয় নতুন ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকের। এরাই ব্যবসা ও শিল্পের নতুন বৃহৎ মালিক হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার দর্শনের সঙ্গে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের আবির্ভাব ও বিকাশ সংগতিপূর্ণ। দেশের ভেতর বর্ধিত বেকারত্ব ও নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের সঙ্গে এই খাতের বিকাশের তাগিদ খুবই সংগতিপূর্ণ ছিল। এভাবেই নতুন এই বর্ধনশীল খাতটি সরকারি ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন আনুকূল্য পেতে থাকে। উঠতি ধনী লোকেরা এসব প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিপুলসংখ্যক দরিদ্র বেকার পরিবারের কিশোরী তরুণী নারীরা খুব স্বল্প বেতনে এবং দীর্ঘ সময় কাজ করে এ খাতে নতুন শ্রমশক্তি তৈরি করে।

নব্বইয়ের দশকের মধ্যে শিল্প খাতে ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানাই সব দিক থেকেই প্রাধান্যে আসে। এই খাতে সবচাইতে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি দেখা যায় রপ্তানিমুখী গার্মেন্টসে (ছক-৩)। বিজিএমইএর সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, এখন গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা প্রায় ৫০০০, যার মধ্যে চালু অবস্থায় আছে ৩৫০০ এর বেশি। শিল্প খাতের মোট কর্মসংস্থানের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি গার্মেন্টসেই। এছাড়া ব্যক্তিমালিকানায় আরো যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখা যায় সেগুলো হলো ওষুধ, চামড়া প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পানীয়, জুতা, সিরামিকস। সব মিলিয়ে জিডিপিতে শিল্প খাতের অনুপাত প্রধানত গত এক দশকে ধীরে হলেও বেড়েছে। এই বৃদ্ধির নিয়ামক বিভিন্ন রপ্তানিমুখী কারখানা, বিশেষত পোশাক শিল্প।

> বাংলাদেশের মানুষ যখন ১৯৭১ সালে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে যুদ্ধে নেমেছে, তখন ভিয়েতনাম সামনে ছিল অপরাজেয় জনশক্তির একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে।

ছক-৪ এ জিডিপিতে শিল্প খাতের অনুপাত পরিবর্তনের চিত্র পাওয়া যায়। তবে এখানে লক্ষণীয় দিক হলো, অনুপাতে ক্ষুদ্র শিল্পের অবস্থান আপেক্ষিক অর্থে কমেছে। পুরনো হিসাবের সঙ্গে নতুন পদ্ধতি মিলিয়ে বিবেচনা করলে ক্ষুদ্র শিল্প খাতের অনুপাতে হ্রাস দেখা যায়। আশির দশক পুরোপুরি বিশিল্পায়নের দশক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নব্বইয়ের দশকে শ্লথ গতি থাকলেও পরবর্তী দশকে একটানা প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। বৃদ্ধির হার সবচাইতে বেশি দেখা যায় তৈরি পোশাক, সিমেন্ট ও পানীয় উপখাতে। সিমেন্ট উৎপাদনের বৃদ্ধির সাথে নির্মাণকাজের প্রবৃদ্ধি সম্পর্কিত। এর সঙ্গে সম্পর্কিত ইটভাটা, যেগুলো শতকরা প্রায় ৮০

ছক ৩ : স্বাধীনতার পর থেকে শিল্প খাতের বিভিন্ন শাখায় উৎপাদন সূচক

বিষয়	১৯৮৫-৮৬ (ভিত্তি বছর: ১৯৭৩-৭৪=১০০)	১৯৮৯-৯০ (ভিত্তি বছর: ১৯৭৩-৭৪=১০০)	১৯৯৪-৯৫ (ভিত্তি বছর: ১৯৮১-৮২=১০০)	১৯৯৮-৯৯ (ভিত্তি বছর: ১৯৮৮-৮৯=১০০)	২০০৯-১০ (ভিত্তি বছর: ১৯৮৮-৮৯=১০০)	২০১২-১৩ (ভিত্তি বছর: ১৯৮৮-৮৯=১০০)
সাধারণ সূচক	১৪০.৪০	১৬৫	২৬২	২০৪	৪৪২	৬২১.১২
খাদ্য, তামাক ও পানীয়	১১৩.২৭	২১২	১৫৩	১৫১.৭৭	৩১৪	৩৭৬.৬৮ (সর্বোচ্চ: পানীয় ৮৫১.২৭)
বস্ত্র (পাট ও সুতা), চামড়া	১০৫.৯	১০৯	২৮৮	২৫১.৪৮	৫৮১	১২১৮.৫৭
এর মধ্যে গার্মেন্টস	-		১৪৫৬	৭১০.৬১	১৬৪৩	৩২১৬.৩১
কাগজ ও কাগজদ্রব্য	১৫৫.১৭	১৬৯	৩২৫	৬৯.৮৫	২১.৮০	৬৬.৪৮
রাসায়নিক দ্রব্য	২৮৩.৮৪	৩৯৩	২৭৬	১৩৫.৬৩	৪০১	৪১৯
সিমেন্ট					৮৩৬.৪২	১০০৬.২২

উৎস: বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৬, ১৯৯০, ১৯৯৬, ২০০০, ২০১৪। বিবিএস, ২০১১।

ছক ৪: ভিন্ন দুই হিসাব পদ্ধতিতে অর্থনীতিতে শিল্পকারখানা (ম্যানুফ্যাকচারিং) এবং বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের তুলনামূলক অবস্থান

মেয়াদ	জিডিপি (পুরনো হিসাব)			জিডিপি (নতুন হিসাব)		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র	মোট	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র	মোট
১৯৭২-৭৩	২.৪০	৫.৫০	৭.৯০			
১৯৮২-৮৩	৫.৭১	৫.৪২	১১.১৪			
১৯৮৯-৯০	৫.০৯	৩.৬৪	৮.৭৪	৯.২৬	৩.৮৪	১৩.১০
১৯৯৫-৯৬	৬.২৭	৩.৩০	৯.৫৭	১১.০১	৪.৪২	১৫.৪৩
১৯৯৮-৯৯	৬.০৩	২.৯৯	৯.০২	১১.১০	৪.৩৭	১৫.৪৭
১৯৯৯-০০	৫.৬৪	২.৮৩	৮.৪৭	১০.৫১	৪.১৭	১৪.৬৮
২০০১-০২				১১.২০	৪.৬০	১৫.৮০
২০০৪-০৫				১১.৭০	৪.৯০	১৬.৫০
২০০৭-০৮*				১৩.৫৫	৩.৩৩	১৬.৮৭
২০০৮-০৯				১৩.৭১	৩.৩৯	১৭.১০
২০০৯-১০				১৩.৭৪	৩.৪৬	১৭.২০
২০১০-১১				১৪.৩২	৩.৪৩	১৭.৭৫
২০১১-১২				১৪.৮৬	৩.৪২	১৮.২৮
২০১২-১৩				১৫.৪৯	৩.৫১	১৯.০০

* ২০০৫-০৬ থেকে পরবর্তী বছরের হিসাব করা হয়েছে এই বছরকেই ভিত্তি বছর ধরে।
উৎস: বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮০, ১৯৯৬, ১৯৯৯, ২০০১, ২০১০, ২০১১, ২০১৪। বিবিএস, ২০১১।

ভাগই বেআইনি। নির্মাণ শ্রমিক ও ইটভাটা শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধিও এই কারণে বেশি।

একদিকে যখন রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ও কিছু বৃহৎ ভারী শিল্প নানা অজুহাতে বন্ধ বা সংকুচিত করা হয় বা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয়, তখন পাশাপাশি অনুকূল নীতি ও প্রণোদনামূলক ব্যবস্থাবলির কারণে ব্যক্তিমালিকানাধীন রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটে। নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৮০-র দশকের শুরুর দিকে এক হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশে শিল্প শ্রমিকদের সংখ্যা তখন ছিল প্রায় ১৮ লাখ, এদের মধ্যে পাঁচ লাখ কর্মরত ছিল বৃহৎ সংস্থায়, বাকিরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে। অশিল্প শ্রমিকদের সংখ্যা তুলনায় বেশি ছিল। নির্মাণ সাত লাখ ২০ হাজার, পরিবহন ছয় লাখ, ব্যবসা দোকান ১১ লাখ, স্বকর্মসংস্থান ১৭ লাখ–সব মিলিয়ে ৭৩ লাখ ৪৫ হাজার।[৫] আশির দশকে শিল্প শ্রমিকদের সংখ্যায় হ্রাস দেখা গেলেও সরকারি হিসাবে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯ লাখে (বাংলাদেশ সরকার, ২০০১)।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী শিল্প শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৭২ লাখ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এর থেকে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি, প্রধানত তরুণ এখন বিদেশে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। এছাড়া সরকারি হিসাব অনুযায়ী, হোটেল-রেস্তোরাঁয় কর্মরত এখন ৮৫ লাখ, যার বিপুল অধিকাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে যুক্ত। পরিবহনের সঙ্গে প্রায় ৪০ লাখ। জিডিপিতে কৃষির অনুপাত অনেক কমে এলেও দুই কোটিরও বেশি নারী-পুরুষ কৃষির সাথেই যুক্ত (বাংলাদেশ সরকার, ২০১৪)।

> এই অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি শুধু এই দেশের ভেতরের গতি বিশ্লেষণ থেকে পুরোপুরি উপলব্ধি করা যাবে না। পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ এবং বিশ্বের অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান যুক্ততা এখন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, কাজের শর্ত, ভোগ চাহিদা, পেশাসহ অনেক কিছুতেই আন্তর্জাতিক মাত্রা এনেছে।

যা হোক, শিল্প শ্রমিক সংখ্যার এই বৃদ্ধির মধ্যে কিছু ধারাবাহিকতা যেমন আছে, তেমনি তার সাথে গুণগত কিছু পরিবর্তনও দেখা যায়। যেসব ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে আছে– (১) বাঁচার মতো মজুরির তুলনায় প্রকৃত মজুরি অনেক কম; (২) ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারবিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক, শতকরা ৫ ভাগের কম; (৩) মোট উৎপাদন মূল্যে অনুপাত অনেক কম হলেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের অবস্থান; (৪) তালিকাবিহীন বহুসংখ্যক কারখানায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শ্রমিকের অবস্থান।

পাশাপাশি শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন দেখা যায় সেগুলো হলো–

(১) শিল্প শ্রমিকদের লিঙ্গীয় গঠনে পরিবর্তন। আশির দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শ্রমিকদের মধ্যে নারী শ্রমিকদের অনুপাত ছিল অনুল্লেখ্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ছাড়া নারী শ্রমিকদের দেখা যেত না। কিন্তু এখন মোট শিল্প শ্রমিকদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ নারী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ছাড়াও এখন গার্মেন্টসসহ রপ্তানিমুখী কারখানায় কর্মরত যেখানে নারী শ্রমিকদের অনুপাত শতকরা ৮০ ভাগ;

(২) রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের শিল্প শ্রমিকদের স্থায়ী কাজ, ন্যূনতম মজুরিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে রক্ষিত হয়নি;

(৩) আগে শিল্প খাতে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য থাকার কারণে শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল এসব প্রতিষ্ঠান। আদমজী পাটকলসহ সেসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা ব্যক্তিমালিকানাধীনে হস্তান্তরিত হওয়ার পর শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বড় রকমের ছেদ পড়েছে;

(৪) রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে মালিকদের ভূমিকায় ছিল সরকার, এখন বৃহৎ ও মাঝারি সংস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মালিক। সরকার এখন তৃতীয় পক্ষ;

(৫) ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থায়ী কাজের অনুপাত খুব কম। বহু প্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে কোনো নিয়োগই দেওয়া হয় না। বহু প্রতিষ্ঠানেই নিয়োগ দেওয়া হয় চুক্তিভিত্তিক বা দৈনিকভিত্তিক। জাতীয়ভাবে ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্ট না থাকায় এসব কারখানায় মজুরি স্তর অনেক নিচে, স্থায়ী নিয়োগ না হওয়ার ফলে মজুরি নিয়ে দরকষাকষি বা আইনি লড়াইয়ের সুযোগ নেই;

(৬) রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন প্রধানত সরকার ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীই ব্যবহার করেছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন

প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই অধিকার আরো সংকুচিত হয়েছে।

পুরনো রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের আন্দোলন-সংগঠনের দেশব্যাপী ব্যাপক শক্তি সমাবেশের সর্বশেষ ঘটনা ঘটে ১৯৮৪ সালের মে মাসে। এরপর শ্রমিক আন্দোলন মালিকশ্রেণির রাজনীতির অধীনস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে আন্দোলন, সংগঠন ও যৌথ মঞ্চ– সবই ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীর অনেকগুলো কারখানা এর মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকদের আন্দোলনের পুরনো কেন্দ্রগুলোও অকার্যকর হয়ে পড়ে। এসব কারণে পরবর্তী সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের ছোটখাটো কিছু ঘটনা থাকলেও পুরনো সংগঠন ও শিল্প শ্রমিকদের নিয়ে বড় কোনো আন্দোলন দেখা যায়নি। শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টিগ্রাহ্য বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় এর প্রায় ২০ বছর পর, সম্পূর্ণ নতুন এক ক্ষেত্রে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে। তবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের এই আন্দোলনের সঙ্গে আশির দশক পর্যন্ত পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলন-সংগঠনের পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে বর্তমানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হলো গার্মেন্টস। গত ১০ বছরে শিল্প শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান বা প্রায় একমাত্র তৎপরতা এ খাতেই দেখা যায়। এই আন্দোলন বেশির ভাগ সময় কোনো নির্দিষ্ট কারখানা বা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হলেও ২০০৬ ও ২০১০ সালে ঢাকা মহানগরীসহ কয়েকটি অঞ্চল অচল করে ফেলার মাত্রায় উঠেছিল। দাবিগুলো অবশ্য এখনও খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের, যার মধ্যে আছে নিয়োগপত্র, সাপ্তাহিক ছুটি, নিয়মিত মজুরি ও বকেয়া পরিশোধ, অতিরিক্ত সময়ের মজুরি প্রদান, কাজের নিশ্চয়তা ইত্যাদি।[৬] ২০০৬ সালে গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণ-অভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষে চুক্তি হয়, যাতে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সমাধানের কথা ছিল। কিন্তু সেসব বিষয় অনেক প্রতিষ্ঠানে সমাধান না হওয়ায় ২০১০ সালে আবারও ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। গার্মেন্টস শ্রমিকদের অধিকাংশ নারী হওয়ার কারণে যৌন নিপীড়নসহ নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ও ক্রমেই সামনে আসছে। ২০১২ সালে তাজরীন অগ্নিকাণ্ড এবং ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের মাধ্যমে গণহত্যার ঘটনা দেখায় যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির পাটাতন কতটা নাজুক এবং শ্রমিকদের বঞ্চনার হার কত মাত্রায় উঁচু।

গত কয়েক দশকে শ্রমিকশ্রেণি ও বৃহৎ অর্থে গ্রাম-শহরে শ্রমজীবী মানুষের বিন্যাস তৈরি হয়েছে অর্থনীতির গতিমুখ থেকেই। এই অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি শুধু এই দেশের ভেতরের গতি বিশ্লেষণ থেকে পুরোপুরি উপলব্ধি করা যাবে না। পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ এবং বিশ্বের অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান যুক্ততা এখন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, কাজের শর্ত, ভোগ চাহিদা, পেশাসহ অনেক কিছুতেই আন্তর্জাতিক মাত্রা এনেছে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের মধ্যেও অভিন্ন কিছু ধরন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আগামী পর্বে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত।

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: anujuniv@gmail.com

পাদটীকা

১) '..we...suffer not only from the development of capitalist production, but also from the incompleteness of that development. Alongside the modern evils, a whole series of inherited evils oppress us, arising from the passive survival of antiquated modes of production, with their inevitable train of social and political anachronisms. We suffer not only from the living, but from the dead.' Karl Marx, Capital, Vol 1, Preface to the First German Edition, London, July 25, 1867.

২) আশির দশকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে লোকসান, দুর্নীতি ও শ্রমিক সংগঠনের বিস্তৃত আলোচনা আছে আনু মুহাম্মদ (১৯৯২) : বাংলাদেশের কোটিপতি, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক (চলন্তিকা বইঘর) গ্রন্থভুক্ত 'বাংলাদেশের শ্রমিক : অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার' প্রবন্ধে।

৩) এই প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে আমার বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ (২০০৫) গ্রন্থভুক্ত 'বিলুপ্ত আদমজী এবং বাংলাদেশে শিল্প খাতের গতিমুখ' প্রবন্ধে। এবং পাট খাতের পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্লেষণের জন্য কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ (২০০৮) গ্রন্থভুক্ত অধ্যায় 'পাট, পাটশিল্প ও পাটভূমি' দ্রষ্টব্য।

৪) বিভিন্ন সুবিধার তালিকাসহ শিল্প খাতের বিস্তারিত গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Anu Muhammad (2002), 'Manufacturing in Bangladesh: Growth, Stagnation and Erosion', Journal of Economic Review, Jahangirnagar University. June.

৫) আশির দশক পর্যন্ত রাষ্ট্র ও শ্রেণীশক্তির পরিবর্তনের ধারার তথ্য ও বিশ্লেষণের জন্য দেখতে পারেন : 'বাংলাদেশের কোটিপতি, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক', পূর্বোক্ত।

৬) গার্মেন্টস শ্রমিকদের পরিস্থিতি, দাবি ও আন্দোলন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন আনু মুহাম্মদ (২০০৭) : 'ফুলবাড়ী, কানসাট, গার্মেন্টস ২০০৬'। এবং আরো পরে Anu Muhammad (2011): 'Wealth and Deprivation: Ready-made Garments Industry in Bangladesh', EPW, August 20। সর্বশেষ অবস্থার জন্য গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি (২০১৪) : 'হাজার প্রাণের চিৎকার', ঢাকা।

অন্যান্য তথ্যসূত্র

[সোবহান ও আহমদ, ১৯৮০] Sobhan, Rehman and Muzaffer Ahmad: Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy of Bangladesh, BIDS: Dhaka.

বাংলাদেশ সরকার (বিভিন্ন বছর ও ২০১৪): বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার: ঢাকা।

[বিবিএস, ২০১০] Bangladesh Bureau of Statistics: Statistical Yearbook of Bangladesh, June, Ministry of Planning: Dhaka.